বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে তিনটি বিভাগ নিয়েঃ
•শাসন বিভাগ (Executive Branch) - আইন কার্যকর করে।
•আইন বিভাগ (Legislative Branch) - আইন প্রণয়ন করে।
•বিচার বিভাগ (Judiciary Branch) - আইন প্রয়োগ করে।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের অপর নাম "নির্বাহী বিভাগ"। শাসন বিভাগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ১. শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশ (নির্বাচিত প্রতিনিধি); ২. শাসন বিভাগের অরাজনৈতিক অংশ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী)। সরকারের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হল শাসন বিভাগ। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ- মুলত এদের নিয়েই এই বিভাগ শক্তিশালী রূপ লাভ করে থাকে।

রাষ্ট্রপতি

বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। তবে রাষ্ট্রপতি হলেও রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করেন- প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। তবে সংবিধানের ৫০ক(২) ধারা মতে, কোন ব্যক্তি দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি হতে হলে একজনকে অবশ্যই ন্যূনতম ৩৫ বছর বয়স্ক এবং বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। রাষ্ট্রপতির উপরে আদালতের কোন এখতিয়ার নেই। তবে সংবিধান লংঘন কিংবা গুরুতর অভিযোগে জাতীয় সংসদ অভিসংশনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করার বিধান রয়েছে। ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করতে পারেন। এছাড়াও তিনি সংসদ অধিবেশন স্থগিত কিংবা প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙে দিতেও পারেন। সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন বিলে তিনি সম্মতি দিলে সেটি আইনে পরিণত হয়। দেশের অভ্যন্তরীন গোলযোগ কিংবা কোন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে জরুরী অবস্থা জারি করতে

পারেন। রাষ্ট্রপতি অনুপস্থিত থাকলে বা পদ শূণ্য থাকলে রাষ্ট্রপতির দ্বায়িত্ব পালন করবেন স্পিকার।
বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
•বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি - সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
•বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি- এডভোকেট মোঃ আব্দুল হামিদ (২১ তম)।
•রাষ্ট্রপতির বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর নাম- প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট (PGR) ও স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (SSF)।
•রাষ্ট্রপতির বাসভবন- বঙ্গভবন।

রাষ্ট্রপতি যাদের শপথ বাক্য পড়ান-
•প্রধান বিচারপতি
•স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার
•প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ

রাষ্ট্রপতি যাদের নিয়োগ দেন-
•প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ
•প্রধান বিচারপতি
•সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বভাগের বিচারপতি
•প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণ
•এটর্নি জেনারেল
•পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্য
•পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিগণ
•মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
•বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ
•বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান
•প্রধান তথ্য কমিশনার ও কমিশনারগণ
•মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান সদস্যগণ
•জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও আইন কমিশনের চেয়ারম্যান

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ)

প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয় প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল পাঁচ বছর। প্রধানমন্ত্রীকে সরকারের স্তম্ভ বলা হয়, কেননা প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে তাঁর মন্ত্রিসভাও ভেঙে যায়।। তিনি একসাথে সরকারপ্রধান, সংসদ নেতা ও মন্ত্রিসভার নেতা। সংসদে আইন প্রনয়ন করা হয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের যেকোন জরুরি অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ছাড়াই তিনি যেকোন নির্দেশ দিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পড়ান রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের ইংরেজি নাম- "Prime Minister's Office" । এটি ঢাকার তেজগাওয়ে অবস্থির। প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নাম গণভবন।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী- শেখ হাসিনা (১৪ তম)।
•বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী- তাজউদ্দীন আহমেদ ।
•বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী- বেগম খালেদা জিয়া।

প্রধানমন্ত্রী পদাধিকার বলে প্রধান-

- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি (ECNEC)
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)

•জাতীয় প্রশাসন পুনর্গঠন/সংস্কার/বাস্তবায়ন কমিটি (NICAR)
•বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ
• বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড
•জাতীয় পরিবেশ কমিটি
•জাতীয় পর্যটন পরিষদ
•রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি
•জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ
•পরিকল্পনা কমিশন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রিসভা

মন্ত্রিপরিষদের নেতা হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে দায়ী থাকেন সংসদের নিকট। মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীগণ সাধারণত সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য কিন্তু সংসদ সদস্য নন, এমন ব্যক্তিও মন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন, এদেরকে বলা হয়- টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী। তবে তার সংখ্যা মন্ত্রী পরিষদের মোট সদস্যের ১০ শতাংশের বেশি হবে না। আইন প্রনয়ন বা পুরাতন আইন সংশোধন এবং জাতীয় সংসদে নেতৃত্ব দেয়াই মন্ত্রিপরিষদের কাজ। তাঁরা সরকারের নীতি জনগণের কাছে তুলে ধরেন আবং নীতির পক্ষে জনমত আদায় করেন। বর্তমান মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংখ্যা- ৪৭ জন।

প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর স্তর দুইটি-
১. কেন্দ্রীয় প্রশাসন
২. মাঠ প্রশাসন

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের চারটি শাখাঃ

১. সচিবালয়ঃ সকল মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় অফিসকে সচিনবালয় বলা হয়।বাংলাদেশে পাঁচটি সচিবালয় আছে-

- রাষ্ট্রপতি সচিবালয়
- কর্মকমিশন সচিবালয়
- নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
- জাতীয় সংসদ সচিবালয়
- বাংলাদেশ সচিবালয়

২. মন্ত্রণালয়ঃ সচিবালয়ের অধীনে একটি প্রশাসনিক ইউনিট হলো মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী হলেন মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক প্রধান সচিব।

৩. অধিদপ্তরঃ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এক বা একাধিক ইউনিট যার প্রধান মহাপরিচালক বা Director General।

৪. পরিদপ্তরঃ অধিদপ্তরের অধীন এক বা একাধিক ইউনিট; যার প্রধান পরিচালক বা Director।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারসমূহঃ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সংক্ষেপে বিসিএস নামে পরিচিত। পাকিস্তান আমলে এর নাম ছিল " সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস অব পাকিস্তান"। ঔপনিবেশিক আমলে এটি "ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস" নামে পরিচিত ছিল, যা সরাসরি ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। বর্তমানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার ২৬টি। ১৯৮০ সালে সিভিল সার্ভিস কাঠামোকে ২৮টি ক্যাডারে বিন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৫ সালে "স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা" ক্যাডারকে ভেঙে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা নামে পৃথক ক্যাডার গঠণ করা হয়। এতে করে ক্যাডার সংখ্যা ২৯ এ উন্নীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালের ৩০ আগস্ট জারিকৃত এক সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি বলে সমবায় ক্যাডার গঠণ করলে ক্যাডার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০টি। ১৯৯২ সালে প্রশাসন এবং সুচিবালয় ক্যাডার একীভূতকরণ আদেশের ফলে ক্যাডার সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ২৯টিতে। ১ নভেম্বর, ২০০৭ সালে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হলে বিচার ক্যাডারের বিলুপ্তি ঘটে এবং এর ফলে ক্যাডার সংখ্যা আরো কমে ২৮টি হয়। ১৫ সেপেটেম্বর, ২০১৪ সালে জারিকৃত বিধান অনুযায়ী টেলিকমিউনিকেশন ক্যাডারের বিলুপ্তি এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালের ১৩ নভেম্বর অর্থনীতি ক্যাডারকে প্রশাসন ক্যাডারের সাথে একীভূত করার দরুন বর্তমানে ক্যাডার সংখ্যা ২৬ টি।

মাঠ প্রশাসন

মাঠ প্রশাসনের স্তর তিনটিঃ
১. বিভাগীয় প্রশাসনঃ এই স্তরের প্রধান হলেন "বিভাগীয় কমিশনার" যিনি যুগ্ম সচিব পদের সমকক্ষ। তিনি কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার দ্বায়িত্ব পালন করেন। মূলত, জেলা প্রশাসকদের কাজের দেখভাল করেন তিনি।
২. জেলা প্রশাসনঃ জেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন "জেলা প্রশাসক'। তিনি জেলার প্রশাসনিক কাজ, রাজস্ব, আইনশৃংখলা উন্নয়নমূলক কাজ প্রভৃতি করে থাকেন।
৩. উপজেলা প্রশাসনঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার সকল উন্নয়ন্নমূলক কর্মকাণ্ড দেখভাল করেন। তিনি উপজেলা কোষাগারের রক্ষক।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার		
স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন		পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন
১) গ্রাম ভিত্তিক স্থানীয় সরকার	২) শহর ভিত্তিক স্থানীয় সরকার	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
ক) জেলা পরিষদ	ক) সিটি কর্পোরেশন	ক) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
খ) উপজেলা পরিষদ	খ) পৌরসভা	খ) রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
গ) ইউনিয়ন পরিষদ		গ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদঃ জেলা পরিষদ গঠিত হয় ১ জন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য এবং সরক্ষিত ৫ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ২১ জনকে নিয়ে। জেলা পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। জেলার জনগণের সরাসরি ভোতে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বাংলাদেশে জেলা পরিষদ ৬৪ টি।

উপজেলা পরিষদঃ ১ জন চেয়ারম্যান, ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (যার মধ্যে একজন মহিলা), সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে কাজ করে থাকেন। উপজেলা পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর। উপজেলা পরিষদ বিল পাস হয় ৭ নভেম্বর, ১৯৮২ সালে। বাংলাদেশে মোট উপজেলার সংখ্যা ৪৯২ টি (সর্বশেষ শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ)।

ইউনিয়ন পরিষদঃ পল্লী অঞ্চলের স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর। ১ জন চেয়ারম্যান, ৯ জন সদস্যা এবং ৩ জন মহিলা সদস্যসহ মোট ১৩ জন নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের মোট সংখ্যা ৪৫৬২ টি। আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম ইউনিয়ন হল সাজেক (বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি) এবং ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)। জনসংখ্যায় বৃহত্তম ইউনিয়ন ধামসেনা (সাভার, ঢাকা) এবং ক্ষুদ্রতম হল হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)।

সিটি কর্পোরেশনঃ বাংলাদেশে মোট সিটি কর্পোরেশন ১২টি। সর্বশেষ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন। ১৩ তম প্রস্তাবিত সিটি কর্পোরেশন হলো ফরিদপুর। সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রধানকে মেয়র বলা হয়। মেয়রকে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেন এলাকা-ভিত্তিক নির্বাচিত কাউন্সিলরগণ। বর্তমান আইনানুসারে সিটি কর্পোরেশনের মেয়াদ বা কার্যকাল ৫বছর।

পৌরসভাঃ ১জন মেয়র এবং ওয়ার্ডভিত্তিক কাউন্সিলরদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। কাউন্সিলরদের এক-তৃতীয়াংশ মলিহাদের জন্য সংরক্ষিত। পৌরসভার কার্যকাল ৫ বছর। বাংলাদেশের মোট পৌরসভা বর্তমানে ৩২৮টি (সর্বশেষ বিশ্বনাথ, সিলেট)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদঃ ১ জন চেয়ারম্যান, ১২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সদস্য, ৬ জন বাঙালি সদস্য, ২ জন নৃ-গোষ্ঠীর মহিলা সদস্য , ১জন বাঙালি মহিলা সদস্য এবং তিন পার্বত্য পরিষদের ৩জন চেয়ারম্যান নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত। চেয়ারম্যান অবশ্যই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হবেন। এ পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর।

(জাতীয় সংসদ ভবন। ছবিঃ দৈনিক নয়াদিগন্ত)

আইন বিভাগ / আইনসভা

সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের আইন পরিষদের নাম "জাতীয় সংসদ" (House of the Nation)। বাংলাদেশের আইন প্রনয়নের সব ক্ষমতা জাতীয় সংসদের। যেকোন নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইন সংশোধন বা পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে জাতীয় সংসদের। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এক-কক্ষবিশিষ্ট। মোট সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। এর মধ্যে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টি। ৩০০ জন সংসদ সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। বাকি ৫০টি সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ৩০০ জন সংসদ সদস্যদের দ্বারা।

জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রীয় অর্থের নিয়ন্ত্রক ও রক্ষাকারী। বাৎসরিক ব্যয়ের অনুমোদন করে জাতীয় সংসদ। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। জাতীয় সংসদের সদসগণ সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করেন। কোন আইন পাশ করতে হলে সংসদে খসড়া বিল আকারে প্রকাশ করতে হয়। এরপর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনে খসড়া বিলটি আইনে পরিণত হয়। সংসদ আহ্বান, স্থগিত কিংবা ভেঙে দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে রাষ্ট্রপতির। তাছাড়া, রাষ্ট্রপতির অভিসংশন করাতে পারেন সংসদ সদস্যগণ।

জাতীয় সংসদের সভাপতি হচ্ছেন স্পিকার। তার অবর্তমানে ডেপুটি স্পিকার দ্বায়িত্ব পালন করে থাকেন। একটি অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে হয়। মোট সদস্য সংখ্যার মধ্যে কমপক্ষে ৬০ জন উপস্থিত না থাকলে সংসদের কোরাম হয় না এবং অধিবেশন শুরু করা যায় না। সংসদের অনুমতি ছাড়া একটানা ৯০ দিন অনুপস্থিত থাকলে সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়।

সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতাঃ (সংবিধানের ৬৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী)
১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
২. ন্যূনতম ২৫ বছর বয়স হতে হবে।

একনজরে একাদশ জাতীয় সংসদঃ

সংসদ নেতা- শেখ হাসিনা।
•বিরোধীদলীয় নেতা- রওশন এরশাদ।
•স্পিকার- ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।
•ডেপুটি স্পিকার- ফজলে রাব্বী মিয়া।
•সংখ্যাগরিষ্ঠ দল- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।
•বিরোধী দল- জাতীয় পার্টি।
•সংসদ গঠনকাল- ৩ জানুয়ারি, ২০১৯ ।
•প্রথম অধিবেশন- ৩০ জানুয়ারি, ২০১৯।
•সংসদ উপনেতা- সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী।
•বিরোধীদলীয় উপনেতা- জি এম কাদের।
•চীফ হুইপ- নূর-ই-আলম চৌধুরী।
•বিরোধীদলীয় চীফ হুইপ- মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ।

স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী (ছবিঃ দৈনিক যুগান্তর)

বিচার বিভাগ

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা, অপরাধীর শাস্তি দেয়া এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা হয় ১ নভেম্বর, ২০০৭ সালে। বিচার বিভাগ আইনের অনুশাসন এবং সংবিধানকে সমুন্নত রাখে।

সুপ্রিম কোর্ট

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত হলো সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রধান বিচারপতি রয়েছেন যাকে সংবিধানের ৯৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হতে হলে একজকে কমপক্ষে ১০ বছর সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কিংবা বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় পদে ১০ বছর বিচারক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত নিজ পদে কাজ করতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের মূলত দুটি বিভাগঃ

১. আপিল বিভাগঃ আপিল বিভাগ মূলত হাইকোর্টের রায়, ডিক্রি বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করে শুনানির ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্রপতিসহ আইনের কোন ব্যাখ্যা চাইলে আপিল বিভাগ এ বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দেয়। আইনের ব্যাখ্যা, ন্যায়বিচার সংরক্ষণ ও পরামর্শ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে সুপ্রিম কোর্টকে সংবিধানের রক্ষক বলা হয়।

২. হাইকোর্ট বিভাগঃ নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য নির্দেশ জারি করতে পারে হাইকোর্ট। কোন ব্যক্তিকে মূলিক অধিকারের পরিপন্থী কোন কাজ করা থেকে বিরত রাখা কিংবা সেই কাজকে বেআইনি ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখে হাইকর্ট। অধঃস্তন কোন আদালতের কোন মামলায় সংবিধানের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতা দেখা গেলে সেই মামলা হাইকোর্টে স্থানাতর করা হয়। অধঃস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করা এবং সকল অধঃস্তন আদালতের কার্যবিধি পরিচালনা করাও হাইকোর্টের কাজ।

এক নজরে সুপ্রিম কোর্টঃ

•বর্তমান প্রধান বিচারপতি- সৈয়দ মাহমুদ হোসেন (২রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮- বর্তমান)।
•বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি- এ এস এম সায়েম।
•সুপ্রিম কোর্টের প্রথম নারী বিচারপতি- নাজমুন আরা সুলতানা।
•আপিল বিভাগের বেঞ্চের সংখ্যা- ৩।
•আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চ গঠিত হয়- প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ১১ জন বিচারপতির সমন্বয়ে।
•হাইকোর্টের বেঞ্চ গঠন করেন- প্রধান বিচারপতি।
•বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেল- এডভোকেট এ এম আমিন উদ্দিন।
[বি. দ্র.পূর্বের অ্যাটর্নি জেনারেল এডভোকেট মাহবুবে আলম ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সালে মৃত্যুবরণ করেন]

অধঃস্তন আদালত

সুপ্রিম কোর্টের অধীনে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় বিচার বিভাগের অধঃস্তন আদালত আছে। সেখানে ফৌজদারি ও দেওয়ানী মামলা পরিচলনা করা হয়।

জেলা আদালতের প্রধান বিচারক জেলা জজ। তার সহায়তার জন্য আছেন অতিরিক্ত জেলা জজ ও সাব-জজ।
•জেলা জজের অধীনে প্রত্যেক জেলায় সাব-জজ ও সহকারী জজ আদালত আছে।
•গ্রাম আদালত হল বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিবাদমান দুই পক্ষের দুজন করে মোট পাঁচজন নিয়ে এ আদালত গঠিত।
•ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এখতিয়ার শুধু ফৌজদারি মামলার বিচার করা।

বাংলাদেশের অধঃস্তন আদালত মূলত ছয় ধরণেরঃ
১. ফৌজদারি আদালত- দায়রা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।
২. দেওয়ানি আদালত- জেলা জজ আদালত ও সহকারী জজ আদালত।
৩. সালিশি বোর্ড- মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ছোটখাটো মামলা নিষ্পত্তি করে।
৪. গ্রাম্য আদালত

৫. পারিবারিক আদালত- একজন সহকারী জজ এই আদালতের দায়িত্বে থাকেন। তালাক, যৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে এই আদালত রায় দেন।
৬. কিশোর আদালত- কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য নিয়োজিত এই আদালত টঙ্গীতে অবস্থিত।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালঃ

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ট্রাইব্যুনাল- ১ গঠন করা হয় ২৫ মার্চ, ২০১০ সালে এবং ট্রাইব্যুনাল- ২ গঠন করা হয় ২২ মার্চ ২০১২ সালে। ট্রাইব্যুনাল দুটিকে একীভূত করা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সালে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনঃ

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদে বহুল আলোচিত এই আইনের বিলটি পাস হয় এবং ৮ অক্টোবর, ২০১৮ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিলটিকে আইনে কার্যকর করেন। আইনটির মোট ৬১টি ধারা মধ্যে জামিন অযোগ্য ১৪টি, জামিন যোগ্য ৫টি এবং ১টি সমঝোতা সাপেক্ষে। এই আইনে ন্যূনতম শাস্তির মেয়াদ ১ বছর এবং সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড।

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালঃ

২০০২ সালের ১০ নভেম্বর দেশের তৎকালীন ৬টি বিভাগীয় শহরে একটি করে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ছয় ধরণের অপরাধ, যথাঃ হত্যা, ধর্ষন, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, মাদক দ্রব্য এবং মজুদদারী- এসবের বিচার এখানে দ্রুত সম্পাদন করা হবে।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৯৮২ সালে দুইটি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। এরমধ্যে একটি ঢাকায় এবং অপরটি বগুড়ায়।